প্রসঙ্গ : শম্ভু মিত্র - নাটক ও জীবন

অমিত আচার্য

কোন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা গড়ে ওঠে তার সাহিত্য, শিল্পকলার ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম নির্ণায়ক হল নাট্যচর্চা। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধি লাভ করেছে ধারাবাহিক নাট্যসাহিত্য ও তার চর্চার মধ্য দিয়ে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে যে নাট্যতাত্ত্বিক ও নাট্যকারদের অমূল্য অবদনের মাধ্যমে তাঁরা হলেন ভরত, ভাস (সর্বাপেক্ষা অধিক নাটকের রচয়িতা), শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, চারুদত্ত, শ্রীহর্ষ, বানভট্ট প্রমুখ। সেই সুপ্রাচীন নাট্যসাহিত্যে ধারাবাহিকতা ও তার প্রহমানতার মূর্ত প্রকাশ দেখতে পাই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা নাটক রচনা ও তার চর্চার মাধ্যমে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর বাংলা নাটক যাঁদের হাত ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন শ্রী শম্ভু মিত্র। আলোচ্য নিবন্ধে শম্ভু মিত্রের জীবন ও নাট্যচর্চার বিভিন্ন দিক ও তার অমূল্য অবদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ও তার জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ পূর্বক স্মৃতিতর্পণ করব।

নাটক সমাজের দর্পণ। সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার দ্বান্দ্বিকতা, ব্যক্তিজীবনের হতাশা, প্রেম, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিকতা মূর্ত হয়ে ওঠে নাট্য রচনা ও তার মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। শম্ভু মিত্র সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে নাট্য ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, নাট্য রচনা, প্রযোজনা, নির্দেশনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যকীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। গিরিশ ঘোষ, শিশির কুমার ভাদুড়ির পর বাংলা নাট্যশিল্প যে স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল শম্ভু মিত্র ছিলেন তার অন্যতম কর্ণধার। এক ভিন্ন ধরনের নাট্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন অভিনেতা, নির্দেশক, সংগঠক ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র। জীবনব্যাপী তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নাট্যপ্রেমী ও নাট্য দর্শকদের জন্য আবেগের কাব্য, মানুষের নিঃসঙ্গতার কাব্য রচনা করেছেন। প্রেম, ভালবাসা, সামাজিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা তাঁর নাট্যভাবনা ও নাট্যকর্মের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখে গেছেন তাঁরা সবাই গণসংস্কৃতির পথ ধরে হেঁটেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভূতপূর্ব অগ্রগমনে উৎসাহিত হয়ে ভারতের শ্রমজীবী

মানুষের মনেও সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও মানবমুক্তির প্রত্যয় শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বের সাথে যুক্ত হয়। এই পটভূমিতেই ভারতে যে গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠেছিল তাতে সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী, লেখক, নাট্যকর্মীরা সামিল হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শম্ভু মিত্র। গণনাট্য সংঘের ল্যাবরেটরি, জবানবন্দী, নবান্ন নাটকের প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। ব্যতিক্রমী অভিনয়শৈলী ও নাটক পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা নাট্যজগতে সুবিদিত। তাঁর সারাজীবনের নাট্যকর্মের মধ্যে মানবজীবনের আবেগ, নিঃসঙ্গতা, ভালবাসা, সমাজজীবনের দ্বান্দ্বিকতা বিশেষ স্থান লাভ করেছে। শুধু অভিনয় নয়, নাট্য নির্দেশনা, প্রযোজনা ও সাংগঠনিক দক্ষতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মরণ করবে। বিচিত্র ধরনের নাটক তিনি করেছেন। বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈভব এনেছেন তিনি। বাস্তব জীবনের গভীরতার উন্মোচন ও অনুসন্ধানই ছিল তাঁর আগ্রহ। পরিচালক হিসাবে গভীরতার অন্বেষণ এবং কাব্যের সুষমা প্রকাশের মধ্য দিয়েই তিনি নাট্য সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ খরেছেন। তাঁর সারাজীবনের নাট্যকর্মের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে গেছেন। শম্ভু মিত্রের মতে শিল্প মানব কল্যাণের সম্পর্ক নির্ণয় করবে। জীবনের প্রতি শিল্পের দায়বদ্ধতা রক্ষার গভীর বোধই তাঁকে ব্যতিক্রমী নাট্যব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ঐতিহাসিক প্রযোজনা নবান্ন'র মধ্য দিয়ে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা মূর্ত হয়েছে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁরই নিজের হাতে গড়া সংগঠন বহুরূপীতে পূর্ণাঙ্গ ২০টি এবং একাঙ্ক ৩টি নাটকের নির্মাতা তিনি। বহুরূপীতে ১৯৭৮ পর্যন্ত তিনি অভিনয় করেছেন। তারপরেও অন্যত্র ৮০-৮১ সালে চার অধ্যায় ও দশচক্র অভিনয় করেছেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশির কুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ নাট্য নক্ষত্রদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে ভাঙ্গলেন। নবান্ন থেকে সেই ভাঙার কাজটা শুরু হয়। প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করার সাধনা শুরু হল বহুরূপীর নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। প্রচলিত নাট্যরীতি ও অভিনয় রীতি থেকে বেরিয়ে এসে শুরু হল নতুনের অন্বেষণ।

শম্ভু মিত্রের সারাজীবনের নাট্যকর্মকে চারটি কালপর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বটি ছিল ব্যবসায়িক সাধারণ রঙ্গালয়ের হাত ধরে পেশাদারী থিয়েটারে যোগদান। তাঁর পূর্বসুরী নাট্যকার মহোদয়েরা কোন না কোন অর্থ উপার্জনকারী পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। গিরিশ ঘোষের পেশা ছিল মুৎসুদ্দিগিরি, শিশির কুমার ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। শম্ভু মিত্র এক রক্তের সম্পর্কহীন দাদার সংসারে থাকতে

থাকতে নিজেকে নাট্যকর্মের সাথে যুক্ত করে নাট্যজীবনের সূচনা করেন। সময়টা ছিল ১৯৩৯। বয়স মাত্র ২৪। ব্যবসায়িক প্রথম নাটকগুলি ছিল : বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায' ('৩৯), প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' ('৩৮), গৌর শী রচিত এবং অহীন্দ্র চৌধুরী নির্দেশিত ঘূর্ণী (৪০)। এই তিনটি নাটক অভিনীত হয় রংমহল নাট্যমঞ্চে। এরপর মিনার্ভায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জয়ন্তী(৪০)। পরবর্তী নাটকগুলি হল : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী(৪০), বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর(৪০)। তারপর শিশির কুমারের নির্দেশনায় পাঁচটি নাটক - জীবনরক্ষা(৪০), উড়োচিঠি(৪১), যোগেন চৌধুরীর সীতা(৪১), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলমগীর(৪১), জলধর চট্টোপাধ্যায়ের রীতিমত নাটক-এ তিনি অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের সাথে নিজেকে কিছুদিন যুক্ত রেখে ভিন্নধর্মী নাটকের দলে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাম্যমান নাট্যদলে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন যে এগুলো তাঁর মনের মত নাটক নয়।

তাঁর নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয় বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্যের অনুরোধে ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদানের মাধ্যমে। সেটি পরবর্তীকালে ভারতীয় গণনাট্যের রূপ নেয়। শম্ভু মিত্রের নাটক নির্দেশনার হাতেখড়ি হয় বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরি ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হোমিওপ্যাথি এই দুই নাটকের মধ্যে দিয়ে। তাঁর বৃহত্তম নাট্যজীবন শুরু হয় বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন পরিচালনার মধ্য দিয়ে। নবান্ন মঞ্চস্থ হয় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৪ সালে। নবান্ন বাংলা নাট্যমঞ্চে অন্যতম দিক্‌চিহ্ন। গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে তাঁর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতি চরিত্রে শম্ভু মিত্র অভিনয় করেন। গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের উদ্যোগে ও প্রযোজনায় রক্তকরবী অভিনীত হয়। এই প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র রাজা চরিত্রে অভিনয় করেন। আর গেরুয়াধারী কমণ্ডলু হাতে বিশু পাগলের অভিনয় করেন .... ।

শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে গণনাট্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে সৎনাট্য বা ভালো নাটক করার যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা রাজনৈতিক সমাজভাবনার দ্বান্দ্বিকতা দীর্ণ কারণে সফল হয়নি। সৎনাট্য নিবন্ধে শাঁওলি মিত্র বলেন, পরাধীন দেশের অমানবিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের সূত্রপাত এক আদর্শ ভাবনায় ভাবিত হয়ে। তাই এই নাট্য ধারণা আন্দোলন শব্দের মর্যাদা পেল; পরিচিত হল নব নাট্য আন্দোলন হিসেবে। এই গণনাট্য আন্দোলনের পাটাতনেই নবান্ন নাটক তুলে ধরেছিল না খেতে পাওয়া মানুষের কঙ্কালসার করুণ কাব্য। যে রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা হল মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ। শাঁওলি মিত্রের ভাষায় : দুর্ভিক্ষের

থাবার চিহ্ন মিলিয়ে যাবার পূর্বেই ঘটে গেল দাঙ্গা। ১৯৪৬-এর সেই ভয়ঙ্কর হানাহানি। সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতেই স্বাধীনতা, তারপর আবারও দাঙ্গা। সারা দেশেই আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। স্বাধীন হতে না হতেই গান্ধী হত্যা হয়েছে। এরকম সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবনের চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি মিত্রকে নাট্য নামক শিল্পের কাজ করার অঙ্গীকার করালেন। তিনি ঠিক করলেন ভালো করে ভালো নাটক মঞ্চস্থ করব। গণনাট্য সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন তাঁরা। শিল্পের উপরে রাজনৈতিক তরবারির আস্ফালন তাঁদের বাধ্য করেছিল সম্পর্ক ছিন্ন করতে। শম্ভু মিত্র ও মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কোনো কথার কোনো মূল্য থাকছিল না সংঘে। কমিউনিস্ট পার্টি নির্দেশিত ও পরিচালিত গণনাট্যের পাটাতন ওঁরা ত্যাগ করলেন। গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে বিজন ভট্টাচার্যের মূল্যায়নটি প্রণিধানযোগ্য। 'গণনাট্য সংঘের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা এসে পড়ে। কেননা রাজনীতি বিবর্জিত শিল্পকর্মের কথা কী সঙ্গীতে, কী নাট্যচিন্তায় ভাবনায় অন্তত গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া ভাবা যায় না। তাই বলে নিছক রাজনীতি প্রভাবিত কোনো শিল্পকর্মই কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে পড়বে না। ইমোশন ও ভাবরাজ্যে যার আনাগোনা সেখানে সবসময় লাঠিবাজি চলে না। মুষ্টিবদ্ধ আন্দোলন অনেক সময়ই জোলো মনে হয়। ... প্রগতিশীল শিল্পকর্মে এই টাইট রোপ ওয়াকিং শিল্পীকে জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে বহু আয়াসে আয়ত্ত করতে হয়। ... জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাঁদের চোখ দিয়ে দেখা, আবার শিল্পসৃষ্টির সময় জনসাধারণের বাইরে এসে শিল্পীর চোখে দেখা যুগবৎ এই দর্শন প্রকরণের ভিতর দিয়েই সত্য নিরূপণ করা সম্ভব।'

সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির দ্বন্দ্বে শম্ভু মিত্র গণনাট্যের বহুজনের অশৈল্পিক চিন্তা ও মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আস্থা অপেক্ষা নিজের ব্যক্তিচিন্তাসঞ্জাত দর্শনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। ব্যক্তিচিন্তার দর্শন থেকেই শম্ভু মিত্র নিজের সংগঠন গড়ে তোলেন। বহুরূপী সংগঠন গড়ে ওঠার পর যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠন পরিচালিত হয়ে শেষপর্যন্ত সমষ্টি বনাম ব্যষ্টির দ্বন্দ্বের সূত্রানুসারেই অনুগত শিষ্যদের একাংশের চক্রান্তে অপমানিত হয়ে অভিমানে তাঁকে বহুরূপী ছাড়তে হয়েছে।

শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবনের তৃতীয় কালপর্ব শুরু ১৯৪৮ সালে। গণনাট্য ছেড়ে চলে এসে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে বহুরূপী নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন। বহুরূপীকে কেন্দ্র করেই শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনা ক্রমশ চূড়ান্ত সিদ্ধির চূড়ায় পৌঁছায়। বহুরূপী নাট্যসংস্থাটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শম্ভু মিত্র নাট্যভাবনার এক বিশেষ দিক উন্মোচিত করেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভাল নাট্যসংস্থা গড়ে তুলতে গেলে সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন। বহুরূপী গড়ে তোলার আগে এই ধরনের কোন নাট্যসংস্থা ছিল না। বৈজ্ঞানিকভাবে একটি নাট্যসংগঠন গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

তাঁর নাট্যভাবনাসঞ্জাত নাট্য সংগঠনের আদর্শ মডেলটি অনুসরণ করে অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব হয়। নাটক, মঞ্চায়ন, মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। নবান্ন পুনরাভিনয় দিয়ে বহুরূপী নাট্যদলের সূচনা। ১৯৫০ সালে কলকাতার সিনেমা হল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বহুরূপীর প্রথম নাট্যোৎসব সংগঠিত হয়। সেখানে তুলসী লাহিড়ী রচিত পথিক, ছেঁড়াতার, শ্রী সঞ্জীব ছদ্মনামে শম্ভু মিত্র রচিত উলুখাগড়া এই তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের সমস্ত নাট্যকর্মকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক গূঢ়তর সত্য অন্বেষণে তাঁর নাট্যভাবনা লালিত। তাঁর নাট্যকর্মের মূল প্রেরণা হল সমাজভাবনা। গোটা সমাজের চেহারাটা চিনে নিতে পারি তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে। পথিক নাটকে খনি মজুরের জীবনের কথা, উলুখাগড়ায় শহর জীবনের উচ্চ মধ্যবিত্ত এক ফাঁপা সংসারের লোভ লালসার কাহিনী, ছেঁড়াতার গ্রামীণ কৃষক জীবনের দারিদ্রক্লিষ্ট উপাখ্যান। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনায় বারবার ফিরে আসে বিভিন্ন সমস্যার কথা। ১৯৫১ সালে শম্ভু মিত্র রচিত অভিনীত ও নির্দেশিত নাটিকা বিভাব মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের আশ্চর্য কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। বিভাব নাটকটিতে আলো, সাজসজ্জা কিছুই থাকত না। মাইমধর্মী এমনই এক নাট্যকৌশল এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছিল সেখানে মঞ্চে ঘরবাড়ি, রাস্তা, মিছিল, গুলিচালনা সবই প্রকাশ পেত।

বাংলার নাট্যমঞ্চে দিগন্ত সৃষ্টিকারী ইতিহাস রচিত হল শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের চারঅধ্যায় মঞ্চস্থ হল। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লক্ষণীয়, শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের কোন নাটককে বেছে নেননি। রবীন্দ্রনাথের অনেক উল্লেখযোগ্য নাটক থাকা সত্ত্বেও তিনি বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাস চারঅধ্যায়। এর মূলে রয়েছে শম্ভু মিত্রের স্বতন্ত্র নাট্যভাবনা। শম্ভু মিত্র অন্তরের অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই নাটক নির্বাচন করেন। সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও জীবনকে বুঝে নিয়ে গভীর কোন সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি চারঅধ্যায় কে বেছে নিলেন। উপন্যাসটি নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করা হল। এই প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন অনেকগুলি চিন্তা যা আমার মনে আবছা ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটা রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে স্পষ্টতর হল। এর থেকে এটাই বোঝা গেল তার মনে যে ভাবনাগুলি ঘুরপাক খাচ্ছিল সেগুলি চারঅধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল বলেই তিনি চারঅধ্যায়কে বেছে নিয়ে মঞ্চস্থ করলেন। সত্যানুসন্ধানের প্রত্যয়ই শম্ভু মিত্রকে নাটক বাছতে অনুপ্রাণিত করেছিল। চারঅধ্যায় থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিলে নাটকের মর্মবাণীটি পরিষ্কার হবে। এই উদ্ধৃতিটির অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর বোধ শম্ভু মিত্রের নাট্য দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল। উদ্ধৃতি,দুটো নিম্নরূপ। প্যাট্রিয়টিজম-র থেকে যা বড় তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের প্যাট্রিয়টিজম কুমীরের পিঠে চড়ে পার হওয়া খেয়া নৌকা।

মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লোভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি, একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়।

আর একটি উদ্ধৃতি : স্বভাবকে মেরে কোন মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্রবান জীব মনে করলে সত্য মনে করা হবে।

চারঅধ্যায় মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে তিনি একটি ঈপ্সিত লক্ষ্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। সেই লক্ষ্যটি হল ব্যক্তির সাথে সমাজ ও রাজনীতির জটিল সম্পর্কের অনুধাবন ও ব্যক্তির গুরুত্বের উপর আস্থা স্থাপন। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনায় ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সমাজ ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে উঠে আসে। এই নাটকের অভিনয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্য শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনার ইতিহাসে এক গভীর বোধের চিহ্ন রেখে গেছে। এলা ও অতীনের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অনুভবের বৈচিত্র্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছিল। এই দুই কুশীলবের অভিনয়ে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র অভিনয় উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখে যান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলালিত ভাষায় সংলাপ নির্ঝরের মত দর্শকের মন ও ভাবনাকে সিঞ্চিত করেছিল। শম্ভু মিত্রের অভিনয় ও সংলাপ প্রক্ষেপনকে মঞ্চের কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। সে কারণে চারঅধ্যায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ। চারঅধ্যায়-এর মঞ্চসফল প্রযোজনার পর যে নাটকটি ইতিহাস সৃষ্টি করল তা হল রক্তকরবী। ১৯৫৪ সালের ১০ই মে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে শ্রেষ্ঠ আধুনিক নাটক হিসাবে পুরস্কৃত হয়। রক্তকরবী সম্পর্কে নাট্যজগতের কুশীলবরা মনে করতেন এই নাটকের অভিনয়-যোগ্যতা নেই। এর সংলাপ অতিশয় কাব্যময় এবং এই নাটকটি সাংকেতিক নাটক হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু এমনই গভীর ও গূঢ়ভাবনা সমন্বিত যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন ছিল। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনার অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিজাত প্রেরণা তাঁকে এই নাটকটি প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করার উৎসাহ জুগিয়েছিল। এই নাটকটির অন্তর্নিহিত দর্শনকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্যব্য নির্ঝর সংলাপ শ্রুতিমাধুর্যে দর্শক হৃদয়ের অন্তর্লোককে এক নান্দনিক বোধে আপ্লুত করেছিল। মঞ্চসজ্জা, আলো এবং অভিনয় নৈপুণ্য রক্তকরবীকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

রবীন্দ্র দর্শনের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, বিশ্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ অখণ্ড জীবনবোধ, মানুষর সার্বিক কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদনের আকুলতা, জীবনের ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার আত্মযন্ত্রণা শম্ভু মিত্রের নাট্যচেতনাকে ভীষণভাবে আপ্লুত করেছিল। সেকারণেই তিনি রবীন্দ্র নাটকে বারবার ফিরে এসেছেন। মুক্তধারা, বিসর্জন ও রাজা নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে উপনিষদীয় আত্মার উন্মোচন ঘটাতে পেরেছিলেন।

রক্তকরবীর পর শম্ভু মিত্র এলেন ইবসেনে; মঞ্চস্থ হল পুতুল খেলা (Doll's House) -র বাংলা রূপান্তর ও দশচক্র। এরপর মঞ্চস্থ হল মুক্তধারা। তারপর কাঞ্চনরঙ্গ হয়ে বিসর্জন নাটকে। এরপর ডাকঘর। দেশবিদেশের সীমানা ভেঙে দিয়ে নাট্যক্ষেত্রকে তিনি অবাধ বিস্তৃতি দিয়েছিলেন। সমাজ রাজনীতির চিত্র প্রকাশ পেল এই দুটি বিদেশী নাটকে। পুতুল খেলায় প্রেমহীন ভালবাসার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। জীবন ও সমাজের সত্য ফুটে ওঠে এই দুই বিদেশী নাটকে।

১৯৬৪ সালে বহুরূপীর দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে শম্ভু মিত্র অভিনীত ও নির্দেশিত দুটি কালজয়ী প্রযোজনা পাই রবীন্দ্রনাথের রাজা ও সফোক্লিসের রাজা অয়দিপাউস। এই দুটি নাটককে বলা হয়েছিল অন্ধকারের নাটক। নাটক দুটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল এই কথায়। এই নিয়ে সেদিন তর্ক উঠেছিল নাট্যমোদীদের মধ্যে। নাট্যক্যারের অনুসন্ধান তো আলোর, কেন তবে এই অন্ধকারের আহ্বান? এই অন্ধকার শব্দটি শম্ভু মিত্রের ভাবনায় এক দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে। এই অন্ধকার আলোর বিপরীতার্থক শব্দ নয়। এই অন্ধকার মূলত মুদিত নয়নে ধ্যানলোকের অন্ধকার। বহির্জগতের কোলাহল ও শব্দমুখর ব্যস্ত জীবন থেকে সরে এসে চিন্তার গহন গভীরতায় যখন মগ্ন হই, তখন ভেতরের সেই অন্ধকার কিন্তু শূন্যতার রূপ নয়, সত্যকে খুঁজে পাওয়ার একটি উপযোগী পরিমণ্ডল। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে যেমন নবজাতক বহির্বিশ্বের আলোয় আসে, সেভাবেই অন্তরের উপলব্ধি থেকে সত্যের জন্ম হয়। বহুরূপীর নাট্যজনেরা বলেছিলেন মানবজীবনের রহস্যময় অন্ধকার জড়িয়ে আছে এই নাটক দুটিতে। শাঁওলি মিত্র শম্ভু মিত্র ও সৎনাট্য গ্রন্থে লিখছেন : '... অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের অসীম বাসনা বুকে নিয়ে চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর জ্ঞানের লিপ্সা তাঁকে থামতে দেয় না। মানুষের এই পরিণতি একই সঙ্গে অত্যন্ত মহৎ ও অতীব করুণ। সেই ট্র্যাজিক জীবনের প্রতিফলন এই দুটি নাটকেই বিদ্যমান। রাজা নাটকে রাণি সুদর্শনা এবং অয়দিপাউস -এর রাজা অয়দিপাউস এই অনন্ত সত্যেরই সন্ধান করেছে। গ্রিক নাটকে নিয়তি বা নেমেসিস নায়ককে এক অন্তিম পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যা তাঁর জীবনে চরম ট্র্যাজেডি ডেকে নিয়ে আসে। শেক্সপীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডিতে ধীরোতাত্ত গুণান্বিত নায়ককে তাঁর চরিত্রের অন্তস্থিত খুঁত বা Flaw বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। গ্রিক নাটকে ট্র্যাজিক পরিণতির কারণ ভাগ্যবাদ বা কপাল লিখন — অয়দিপাউস অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সত্যের আলোতে উপনীত হওয়ার চরম আকাঙ্খায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তৎকালীন গ্রিস দেশের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ জয়ী রাজা রাণির অধিকার পাবে। ভাগ্যের পরিহাসে নিজের অজান্তে রাজা

অয়দিপাউস মায়ের সাথে যৌনমিলন, মায়ের গর্ভে নিজের সন্তানের জন্মদান করেছিল। তাই কোন পাপ বা অন্যায় স্পর্শ করতে পারেনি অয়দিপাউসকে। এই নাটকের মূলে আছে অয়দিপাউসের সত্যের তৃষ্ণা ও তাঁর দেশপ্রেম। সত্যকে জেনে অয়দিপাউসের জীবনে নেমে এল চরম বিপর্যয়। রাজা জানতে পারলেন তিনি পিতৃহন্তা আপন জন্মদাত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই পাপের উৎসে রয়েছেন তিনি স্বয়ং; অনুশোচনায় আত্মধিক্কারে তিনি উপড়ে নিলেন নিজের চোখ। নাটকের শেষ অংশে রাজা বলছেন, নিয়তি কি সঞ্চিত রেখেছে আমার জন্য? নিজের হাতে চোখের আলোকে নিভিয়ে দিয়ে অয়দিপাউস অন্ধকারের সামনে দাঁড়ায়। আর তখনই সে ফিরে পায় প্রশান্তির অভিজ্ঞান, অন্ধকার তখন গভীরতম আলো। রাজা নাটকেও এইরকম ভাবনা — সেই কঠিন অন্ধকারের অনুভূতি ব্যতিরেকে বাইরের পৃথিবীর চঞ্চল বসন্ত উৎসবের মধ্যে রাজাকে চেনা যায় না। ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে নিজের মধ্যে অনুভব করলেই আলোতে বেরিয়ে এসে এই পৃথিবীর উৎসবকে বুঝতে পারা যায়। রাণি সুদর্শনার এই আত্মপোলব্ধিই এই নাটকের মূল বিষয়। রাণি সুদর্শনা আপন রূপের গর্বে, বুদ্ধি ও গুণের অহঙ্কারে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। রাজা তাকে বাইরের আলোতে নিয়ে আসছেন। রাজা বলছেন — এবার আমার সঙ্গে এসে, বাইরে চলে এস — আলোয়। শম্ভু মিত্র গ্রিক ক্লাসিক নাটক রাজা অয়দিপাউস ও রাজা নাটকের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে ইউরোপীয় মঞ্চভাবনা ও ভারতীয়তাবোধের উদ্ভাস ঘটিয়েছেন।

শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবনের চতুর্থ পর্যায়টি হল সমষ্টি ও ব্যষ্টির দ্বন্দ্বে তাঁর হাতে গড়ে তোলা নিজস্ব সংগঠন বহুরূপী থেকে ক্রমে দূরত্ব বাড়িয়ে সংঘ ত্যাগ। বহুরূপী সংগঠনকে যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করার চূড়ান্ত প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও অনুগত শিষ্যদের একাংশের চক্রান্তে অপমানিত হয়ে অভিমানে তাঁকে সংগঠন ছাড়তে হয়েছিল। গভীর বেদনায় তিনি মূক ছিলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে বহুরূপীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে ক্রমশ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ এই সময়কালের মধ্যে শম্ভু মিত্রের পর শাঁওলি মিত্র, তারপর তৃপ্তি মিত্রও বহুরূপী ত্যাগ করলেন। শাঁওলি মিত্র শম্ভু মিত্রের এই সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে বলেছেন : ‘ আমাদের আর একবার ফিরে যেতে হবে ৭৮ সালে যখন থেকে বহুরূপীতে তাঁর অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। তিনি সংগঠনের অনেক কাজকর্ম সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করতেন, সংগঠন চালানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অখুশি ছিলেন। তবুও তিনি অভিনয় করতেন। ৭৮-এর এক নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে শম্ভু মিত্র অভিনীত নাটকগুলি আর অভিনীত হয়নি। মোটকথা, বহুরূপী সংগঠনে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠিচক্রের দ্বন্দ্বের শিকার শম্ভু মিত্র দল ছাড়লেন। ৭১-

এর পর নতুন নাটক নির্দেশনা না করলেও ৭৮ পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় ডাকঘর নাটকের নবনির্মিতিতে ঠাকুরদা করেছেন। টেরোডাকটিল নাটকে প্রফেসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছন। এর পরবর্তী সময়ে তাঁর নির্দেশনায় বাদল সরকারের বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, নীতিশ সেনের বর্বর বাঁশী এবং বিজয় তেণ্ডুলকারের নাটক অবলম্বনের চোপ আদালত চলছে অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে তিনি অন্যের নির্দেশনায় অভিনয় করেছেন। বহুরূপী পর্বেই বাংলা নাট্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠা সমিতির নাট্যোৎসবের জন্য অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় দুটি দলের একটি সম্মিলিত অভিনয়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ মুদ্রারাক্ষস-এ অভিনয় করলেন। এই প্রযোজনায় রাক্ষসের চরিত্রে কুমার রায় এবং চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাণক্য-এর চরিত্রে শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, ১৯৮০ সালে কটি নাট্যদলের শিল্পীদের নিয়ে গড়া ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটারের প্রযোজনায় ব্রেশটের বিখ্যাত নাটক গ্যালিলিওর মোহিত চট্টোপাধ্যায়কৃত বাংলা রূপান্তর গ্যালিলিওর জীবন এর নাম ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের সাড়াজাগানো অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করেছিল। অভিনয়ের মাধ্যমে তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছিলেন।

শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যজীবনের উপান্তে রচনা করলেন চাঁদ বণিকের পালা যা অনেকদিন ধরে লেখা হয়েছে পর্বে পর্বে। পুরাণের ধর্ম উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই পালায় শম্ভু মিত্রের রাজনীতি সমাজ বীক্ষণ, নাট্যদর্শন ও জীবনদর্শন সবকিছুর সমন্বিত রূপের প্রকাশ ঘটেছিল। নিজের অভিজ্ঞতার সাথে বিশ্বজীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে তিনি এমন এক দর্শনে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মধ্যে সর্বপ্রকার নাট্যরীতির যোগফল খুঁজে পাওয়া যায়। এক গম্ভীর দার্শনিকতা বোধকে আশ্রয় করে নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। শম্ভু মিত্র চাঁদ বণিকের পালা-র মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত দর্শনে পৌঁছে যান তাঁর নাট্যকার জীবনে তা আসলে সমকালের যন্ত্রণাকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য। এই ছোটো পরিসরে চাঁদ বণিকের পালা-র অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মনসামঙ্গল আখ্যানের কাঠামোকে আশ্রয় করে সমকালের সমাজ, রাজনীতির বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। চাঁদ বণিকের কাহিনীটিকে বিনির্মাণ করে জীবনের বন্ধুর পথ কীভাবে অতিক্রম করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন। চাঁদ বণিকের পালা মঙ্গলকাব্যের মোড়কে আমাদের সমকালীন জীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে। লোকায়ত জীবনের এক অসামান্য দর্পণ হল এই পালা। এ যেন টেনিসনের সেই এনক আরডেন ফিরে এল বহুযুগ পরে, মৃত্যুর ওপার থেকে সর্বস্বান্ত।

বাংলার রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি রূপালী পর্দায়ও শম্ভু মিত্রের শিল্পীসত্ত্বা প্রতিভাত হয়েছে। সিনেমা তথা রূপালী পর্দায় শম্ভু মিত্রের চলচ্চিত্র নির্দেশনা ও অভিনয় শৈলীর কথা অনুক্ত থেকে গেলে শম্ভু মিত্রের শিল্পী জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন বাকি থেকে যায়। এই স্বল্প পরিসরে চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের কথা ব্যক্ত করা হল। ১৯৪৫-১৯৬২ পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। নিচে তাঁর সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল ।

শম্ভু মিত্র পরিচালিত চলচ্চিত্র

১৯৪৫	ধরতি কা লাল	খাজা আহমেদ আব্বাসের সহযোগী পরিচালক
১৯৫৩/৫৪	একদিন রাত্রে	যুগ্ম পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র
১৯৫৩-৫৪	জাগতে রহো	যুগ্ম পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র
১৯৫৯	শুভবিবাহ	যুগ্ম পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র

শম্ভু মিত্র অভিনীত চলচ্চিত্র

১৯৪০ এ টাইনি থিং ব্রিংস ডেথ
১৯৪৫ ধরতি কে লাল (পরিচালনা খাজা আহমেদ আব্বাস, সহকারী শম্ভু মিত্র
১৯৪৭ অভিযাত্রী (পরিচালনা হেমেন গুপ্ত)
১৯৪৮ ধাত্রীদেবতা (পরিচালনা কালীপ্রসাদ ঘোষ)
১৯৫০ আবর্ত (পরিচালনা বিশ্বকর্মা)
১৯৫০ আওয়ার ইন্ডিয়া (পরিচালনা পল জিল্‌স)
১৯৫০ হিন্দুস্থান হমারা (আওয়ার ইন্ডিয়ার হিন্দি)
১৯৫১ বোধোদয় (পরিচালনা নিরঞ্জন পাল)
১৯৫১ বেয়াল্লিশ (পরিচালনা হেমেন গুপ্ত)
১৯৫৩ পথিক (পরিচালনা দেবকীকুমার বসু)
১৯৫৩ মহারাজ নন্দকুমার (পরিচালনা বীরেশ দাস)
১৯৫৩ বৌঠাকুরাণীর হাট (পরিচালনা নরেশ মিত্র) অভিনীত চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী
১৯৫৪ মরণের পরে (পরিচালনা সতীশ দাশগুপ্ত)
১৯৫৪ শিবশক্তি (পরিচালনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়)
১৯৫৫ দুর্লভ জনম (পরিচালনা প্রফুল্ল চক্রবর্তী)
১৯৫৯ শুভবিবাহ (পরিচালনা শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র)